পরিবেশের বিপর্যয় ও স্বাস্থ্য

ডাঃ ভবানী প্রসাদ সাহু

এখনকার শিশুদের শরীরে ৩০০টিরও বেশি এমন ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে, যা তাদের পিতামহদের শরীরে ছিল না। আমাদের শরীর প্রাকৃতিক ভাবে পাওয়া ক্ষতিকর পদার্থকে মোকাবিলা করার ক্ষমতা রাখে। ফলে নানা ধরনের এনজাইম বা উৎসেচকের সাহায্যে এই সব পদার্থ নিষ্ক্রিয় হতে পারে বা শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু আধুনিক মানুষ বিগত মাত্র কয়েক দশকে এমন অজস্র রাসায়নিক পদার্থ তৈরী করছে এবং বিষময় ছড়িয়ে দিচ্ছে, যেগুলি প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্টি হতে পারে না। প্লাস্টিক এই ধরনের প্রকৃতি বিরোধী পদার্থের একটি সহজ উদাহরণ হলো, রয়েছে আরো অজস্র পদার্থ। এর ফলস্বরূপ এরা ধীর গতিতে শরীরেই জমা হচ্ছে। সৃষ্টি হচ্ছে অভূতপূর্ব নানাবিধ রোগ ও অসুস্থতা। প্রাচীন কালের মানুষ দূরের কথা, মাত্র দুই পুষ আগেকার পূর্বসূরীদের মধ্যেও এই ধরনের পদার্থ ছিল না। এর ফলস্বরূপ এখনকার প্রজন্মের শিশুরা শৈশবে ও বড় হয়ে যে সব রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, তাদের অধিকাংশেরই সুষ্ঠু চিকিৎসা এখনো আবিষ্কৃতই হয় নি।

আন্তর্জাতিক ভাবেই এখন এটি জানা গেছে যে, ১৯৯০ সালের পর শিশুদের মধ্যে ক্যান্সারের হার শতকরা ১২ ভাগ বেড়েছে, হাঁপানি বেড়েছে ১৭ ভাগ ও শেখার তথা মনে রাখার ক্ষমতা কমে যাওয়ার মত সামগ্রিক বৈকল্য বেড়েছে ১৬ ভাগ । কিন্তু এটি একটি সাধারণ হিসাব, ভারতের মত দেশগুলিতে এই ধরনের সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত সমীক্ষা অনেক ক্ষেত্রেই অতি দুর্বল। তবু ভারতের ক্যান্সার রেজিষ্ট্রি থেকে দেখা যাচ্ছে, শিশুদের ক্ষেত্রে ১৯৮৮ সালে ক্যান্সারের সংখ্যা ছিল ৪১২৪। ১৯৯৬ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৬১৮৭। বয়স্কদের ক্ষেত্রে ক্যান্সার হওয়ার নানাবিধ কারণ থাকে। কিন্তুর শিশুদের ক্ষেত্রে এই ক্যান্সার এবং হাঁপানি ইত্যাদি সৃষ্টি হওয়ার মূলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রধান ভূমিকা পালন করে পরিবেশগত বিপর্যয় তথা পরিবেশ দূষণ।

আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে প্রকৃতির বিদ্ধে লড়াই করে ও তাকে পদানত করে বাঁচার পথ দেখিয়েছে ; কিন্তু প্রকৃতিকে ভালবেসে জয় করে বাঁচার জন্য উৎসাহিত করে নি। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভিত্তিমূলের এই দার্শনিক দৌর্বল্য মানুষের পক্ষে আত্মঘাতী হিসেবে ব্যুমেরাং - এর মত ফিরে আসছে। মানুষকে তা ক্রমবর্ধমান ভোগবাদী জীবনে অভ্যস্ত হতে শেখাচ্ছে। একই সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য শক্তিশালী করার জন্যও এই বিজ্ঞান প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে। ফলস্বরূপ ক্রমবর্ধমান হারে ঘটছে পরিবেশের বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যের বিনাশ। ভোগবাদী মানুষ তার বিজ্ঞানের শিল্প দিয়ে মাতৃ রূপী প্রকৃতিকে ধর্ষণ করে তাকে আধুনিকতা হিসেবে আর বিজ্ঞান তথা মানুষের জয়যাত্রা হিসেবে চিহ্নিত করছে।

তার ফলও মানুষ ভুগতে শু করেছে কিন্তু আশার কথা, কিছু মানুষ তা অনুভবও করতে পারছেন। এখন বিশেষত শিল্পোন্নত তথা আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এগিয়ে থাকা দেশগুলিতে জন্মগত বৈকল্যের কারণে শিশুমৃত্যুর হার লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে এবং আরো উদ্বেগের কথা হল এই সব বৈকল্যের বেশির ভাগের কারণই সাধারণ চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। বর্তমানে আমেরিকায় জন্মগত ত্রুটির কারণে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা বছরে প্রায় ৬৫০০ এবং ত

ার মাত্র শতকরা ২০ ভাগের কারণ জানা। বাকি ৮০ ভাগের কারণই আমেরিকার মত জ্ঞান-বিজ্ঞানে এগিয়ে থাকা দেশের চিকৎসা বিজ্ঞানীদের কাছেও অজ্ঞাত ও বিভ্রান্তিকর।

তবে এটি বোঝা যাচ্ছে যে, এর পেছনে রয়েছে অজস্র প্রকৃতি-বিরোধী ক্রিয়াকর্ম ও অপ্রাকৃতিক রাসায়নিক পদার্থ। মাতৃগর্ভে শিশুর কোষ বিভাজন ও শারীরিক বিন্যাস অতি দ্রুত ও প্রাকৃতিক ভাবে অতি নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন হয়। এই সময় খাবার দাবার, পানীয় পদার্থ,শ্বাসপ্রশ্বাস, ব্যবহার্য জিনিষপত্র, ওষুধ ইত্যাদি থেকে মায়ের শরীরে যেসব রাসায়নিক প্রবেশ করছে তা অতি সহজে শিশুর কোষ বিভাজন ও কোষকলার বিন্যাসকে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে। এবং তা সম্ভব ঐ সব পদার্থের অতি সূক্ষ্মমাত্রায়, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাপাই যাচ্ছে না।

মাত্র কয়েকটির কথা জানা গেছে, যেমন ধরা যাক ডাই অক্সিন- এর কথা। প্লাস্টিক ও ভিনাইল পুড়লে তার থেকে এটি বাতাসে মেশে। বলা হচ্ছে মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে বিংশ শতাব্দীর নয়ের দশকের শু অব্দি মানুষের জানা বা আবিষ্কৃত রাসায়নিকগুলির মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ২-৩ টির একটি হচ্ছে ডাই অক্সিন। মাত্র এক গ্রাম পলিভিনাইল ক্লোরাইড (পি ভিসি) পুড়লে যে পরিমান ডাই অক্সিন বাতাসে মেশে (০.০৫ মাইক্রোগ্রাম) সেটি ৫০ টি ইঁদুর যদি সমান ভাবে শরীরে গ্রহণ করে তবে তারা প্রত্যেকেই ক্যান্সারে আক্রান্ত হবে। শুধু ক্যান্সার নয়, — বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম ও অপরিণত শিশু প্রসব, মানসিক জনত্ব ও স্থবিরতা, প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়া ইত্যাদির মত ভয়াবহ প্রতিক্রিয়াও ডাই অক্সিনের অবদান। পিভিসি (এক ধরনের প্লাস্টিক) দিয়ে বানানো খেলনা কোন শিশর কাছাকাছি যদি পোড়ে, তবে তার থেকে বেনো ডাই অক্সিন ঐ শিশুকে বয়সকালে বন্ধ্যা করে দিতে সক্ষম । কিন্তু কবে কোন্ ছোটবেলায় খেলনা-পোড়া ডাই অক্সিন শরীরে ঢুকেছিল তার হিসাব বা স্মৃতি কোন ভাবেই থাকে না। জাপানের ইয়োকোহামা ঝিবিদ্যালয়ের গবেষকদের একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে ভারতের মত কম শিল্পোন্নত মানুষের শরীরেও, জাপানের মত শিল্পোন্নত দেশের নাগরিকদের শরীরে থাকা অতি উচচমাত্রার ডাই অক্সিনের প্রায় সমপরিমাণ ডাই অক্সিন রয়েছে । অন্যদিকে শিল্পে ানুন্নত এবং মেন কি কয়েকটি শিল্পোন্নত দেশের মানুষের শরীরে ডাই অক্সিনের পরিমাণ তুলনামূলক ভাবে কম। স্পষ্টতই জাপানীদের মত, আমরা ভারতীয়রাও এই ভয়াবহ রাসায়নিক বিষ আমাদের শরীরে ধীর গতিতে জমিয়ে চলেছি।

টলুইন ডাই আইসোসায়ানেট (টি ডি আই) আরেকটি মারাত্মক রাসায়নিক পদার্থ যা ভারত সহ নানা দেশেরই প্লাস্টিক কারখানায়, ফোম বানাতে ও অন্যান্য নানা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এর থেকে ভয়াবহ হাঁপানি ও ফুসফুসের অন্যান্য রোগের সৃষ্টি হয়। আগে ভাবা হত পরিবেশে ১০০ কোটি ভাগে ২০ ভাগ টি ডি আই মোটামুটি নিরাপদ। কিন্তু পরে ইংল্যাণ্ডের গাড়ি কারখানায় যে সব মহিলা গাড়ির সিটে ফোমের চাদর কেটে সেলাই -এর কাজ করতেন, তাদের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, ১০০ কোটি বাগ বাতাসে মাত্র .৩ -৩ ভাগ টি ডি আই থেকেই তাঁদের অনেকের মধ্যে হাঁপানি সৃষ্টি হয়েছে।

ট্রানসফর্মারের মত নানা বৈদ্যুতিক সরঞ্জামে, বাড়ি পরিষ্কার করার নানা পদার্থ ও স্প্রে- তে পলিক্লোরিনেটেড বাই ফিনাইল (পি সি বি) ব্যবহৃত হয়। দেখা গেছে, এর ফলে গর্ভস্থ শিশুর বিকৃতি ঘটছে, যার ফলে বিকলাঙ্গ শিশুও মানসিক ভাবে জড়বুদ্ধি শিশুর জন্ম হচ্ছে এবং অকালপ্রসবও হচ্ছে। এমনকি প্রজনন ক্ষমতাও হ্রাস পাচ্ছে।

বর্তমান বিশ্ব, বিশেষত ভারতের মত দেশগুলিতে কীটনাশকের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার ঘটছে, এমনকি উন্নত দেশগুলিতে যে কীটনাশক বিপজ্জনক বলে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে , ঐ সব কীটনাশক ঐ সব দেশেরই উৎপাদকরা ভারতের মত তৃতীয় বিশ্বে চালান করছে। এই কীটনাশক শুধু মাঠে যারা ছড়ায় সরাসরি তাদেরই নয়, তাদের জামাকাপড়ে লেগে বাড়িতেও আনছে। শুধু এই ভাবেই দেখা যাচ্ছে, বাড়ির গর্ভবতী মহিলারা এবং শিশুরা কীটনাশকের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে, আর এর ফলে শিশুদের মধ্যে লিউকিমিয়া (একিউট লিম্ফোটিক লিউকিমিয়া, এ এল এল) এর মত প্রাণঘাতী ভয়াবহ রোগের সৃষ্টি হচ্ছে। হচ্ছে রক্তাল্পতাও ।

ব্যাঙ্গালোর ভারতবর্ষের পরিচছন্ন শহরগুলির মধ্যে একটি বলে ভাবা হত, তার বাতাস অন্যান্য অনেক বড় শহরের বাতাসের চেয়ে যথেষ্ট নির্মল। কিন্তু সেখানেও ১৮ বছরের কমবয়সী ২০,০০০ ছেলেমেয়ের মধ্যে হাঁপানি সংক্রান্ত সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, ১৯৭৯ সালে যেখানে শতকরা ৯ ভাগ ছেলেমেয়ে হাঁপানিতে ভুগত, ১৯৯৯ সালে তা হয়েছে শতকরা ২৯ ভাগ, ক্রমবর্ধমান শিল্প, শহরায়ন ও গাড়ির ধোঁয়ার ফলেই এই রোগের ভয়াবহ বৃদ্ধি তাতেও কোন সন্দেহ

নেই।

পরিবেশ থেকে যে অজস্র ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ শরীরে ঢুকছে, তার বিপদের তালিকা অন্তহীন, সাধারণভাবে তা সবসময় সরাসরি অনুভবও করা যায় না। দীর্ঘকাল ধরে সেগুলির প্রভাবে মারাত্মক শারীরিক বিপর্যয় সৃষ্টি হচ্ছে, যেগুলির অধিকাংশই অপরিবর্তনীয় ও প্রাণঘাতী।।

পেন্সিলের দাগ মোছার ইরেজার, নানাবিধ খেলনা, কলকারখানার ধোঁয়া, কাঠের বার্নিস ইত্যাদির থেকে শরীরে ঢোকে আর্সেনিক। ধীরগতিতে আস্তে আস্তে দীর্ঘদিন ধরে শরীরে প্রবেশ করার পর, তা এক সময় ক্যান্সারের সৃষ্টি করে, বিশেষত পাকস্থলীর ও চামড়ার ক্যান্সার।

বাড়ি মোছার নানা ধরনের রাসায়নিক থেকে টলুইন ও ফেনল শরীরে ঢোকে, যার ফলে দৃষ্টি ক্ষমতা কমে যায়। ব্যাটারি, নানা ধরনেররঙ, ধাতব পদার্থের উপর আবরণী পদার্থ বা কোটিং ইত্যাদি থেকে ক্যাডমিয়াম আসে যা আমাদের বৃক্ক তথা কিডনিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। ডিজেলের ও তামাকের ধোঁয়া থেকে শরীরে ঢোকে বেঞ্জোপাইরিন। এটি হাড়ের স্থায়ী ক্ষতি করে ও ছেলেদের শুত্রানুর বিকৃতি ঘটায়। রয়েছে এর অন্যান্য শারীরিক প্রতিক্রিয়াও।

সীসাযুক্ত জলের পাইপ, লেড ব্যাটারি, নানা ধরনের ধোঁয়া — এসব থেকে শরীরে ঢোকে ক্যাডমিয়াম, সীসা ইত্যাদি। এগুলি মস্তিষ্কের গ্রহণ ক্ষমতা অর্থাৎ নতুন কিছু শেখার ক্ষমতা (বিশেষত শিশুদের ক্ষেত্রে) যেমন কমায়, তেমনি ক্যান্সারেরও সৃষ্টি করে। ডিডিটি ও পারদঘটিত পদার্থও একই ধরনের শারীরিক ক্ষতি করে। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার ভারতবর্ষে কীটনাশক ডি ডি টি- র উপর বেশ কিছুদিন ধরে আংশিক নিয়ন্ত্রণ জারি করা সত্ত্বেও, ভারতীয় মায়েদের বুকের দুধে ডি ডি টি- র পরিমাণ পৃথিবীর মধ্যে এখনো সবচেয়ে বেশি।

শুধু ভারতে নয়। ক্যাপটান নামে ছত্রাক বা ফাঙ্গাস মারার যে পদার্থটি আপেল আঙ্গুর, পীচফল ইত্যাদির উপর প্রয়োগ করা হয়, দেখা যাচ্ছে তার থেকে আমেরিকার শিশুরা তাদের শরীরে ক্যান্সার সৃষ্টি করার মোট উপাদানের শতকরা ৩৫ ভাগ গ্রহণ করে ফেলছে। অর্গানোফসফেট জাতীয় কীটনাশক পদার্থ নার্ভের তথা মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের স্থায়ী ক্ষতি করে। এ অবস্থা বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্যবহৃত ভয়াবহ নার্ভগ্যাস জনিত ক্ষতির সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে (নার্ভগ্যাস সিন্ড্রোম)। অতি স্বল্পমাত্রায়ও এটি গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতিসাধন করছে বলে দেখা যাচ্ছে।

পোকামাকড় মারার এই সব পদার্থ আরো বেশি করে মারছে মানুষকেই। প্রাকৃতিক পরিবেশে এই অপ্রাকৃতিক পদার্থে অবাধ ছাড়পত্র অবধারিত ভাবে মানুষের ক্ষতি করছে। প্রকৃতিতে কিছু ফসল ও পোকামাকড়ের একটি স্বাভাবিক ভারসাম্য থাকে। তাই কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থগুলি প্রকৃতি বিদ্ধ। এগুলি মানুষের নার্ভ-এর ক্ষতি শুধু নয়, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বিপর্যস্ত করছে, ডি অক্সিরাইবো নিউক্লিক এ্যাসিড (ডি এন এ) - রও ক্ষতি করছে, এবং মানুষের শরীরে এমন জৈববিপর্যয় ঘটাচ্ছে যার ফলে ক্যান্সার কোষ দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার অনুকূল পরিবেশ পেয়ে যাচ্ছে।

ভোগবাদী মানুষ কত বিচিত্রভাবে যে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটিয়ে শারীরিক বিপর্যয় সৃষ্টি করছে তার মনে হয় সম্পূর্ণ হিসাব দেওয়া সম্ভব নয় এবং তা বাড়ছেও। চুলে ব্যবহার করার শ্যাম্পুতে সামান্য পরিমানে স্ত্রী হরমোন মেশানো হয়। এর ফলে দেখা যাচ্ছে শিশু কন্যাদের মধ্যে অপরিণত বয়সে রজঃস্রাব শু হচ্ছে, এবং অন্যান্য যৌন পরিবর্তন ঘটছে।

শিশুদের জন্য কাঠের ও মাটির খেলনার দিন গেছে। প্লাস্টিকের খেলনা,টেডি বিয়ার, বাচচাদের চিবুনোর মত নানা খেলনা ও বোতল — এসব হাজির হয়েছে। এগুলি থেকে থ্যালেট জাতীয় রাসায়নিক স্বল্প মাত্রায় শিশুদের শরীরে ঢোকে, যা তাদের মানসিক ও শারীরিক — উভয় ধরনের বিকাশকেই কমিয়ে দিচ্ছে। গর্ভবতী মহিলারাও এখন নানা ভাবে এই থ্যালেট জাতীয় পদার্থে আক্রান্ত হচ্ছেন। এর ফলে তাঁদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যেমন কমে, তেমনি গর্ভস্থ শিশু অপরিণত, রোগা ও দূর্বল হয়ে জন্মাচ্ছে। এই অবস্থাকে বলা হচ্ছে গর্ভস্থ শিশু ব্যাহত বিকাশ বা ইন ট্রাইউটেরাইন গ্রোথ রিটার্ডেশান (আই ইউ জি আর)।

এর ফলে অকালপ্রসব ও সদ্যোজাত শিশুর নানাবিধ রোগই দেখা যাচ্ছেনা, জন্মের সময় কিছু যদি নাও বোঝা যায় পরে বড় হয়ে এই সব শিশুদের মধ্যে হৃদরোগ, ডায়াবিটিস, উচচরক্তচাপ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রোগ অনেক বেশি দেখা দেয় ।

গুঁড়ো দুধে নাইট্রেটের মাত্রা বেশি থাকে । এটি মস্তিষ্কে অক্সিজেনের সরবরাহ কমিয়ে দেয়। ফলে মস্তিষ্কের বিকাশ ঠিকমত ঘটে না। শিশুদের ক্ষেত্রে গুঁড়ো দুধ অন্যান্য বিপদের পাশাপাশি এ ধরনের বিপদও ডেকে আনছে। খাদ্যপরিবেশের বিপর্যয় বড়দের ক্ষেত্রেও ঘটছে। টাটকা ফলমূল, শাকসব্জি শষ্যজাত তৈরী করা খাবার- এর পরিবর্তে পিজা, বার্গার ও নানাধরনের ফ্রাই জাতীয় খাদ্য (যাদের বলা হচ্ছে জাঙ্ক ফুড বা জঞ্জাল খাদ্য) থেকে ডায়াবিটিস, হৃদরোগ, স্থুলতা ইত্যাদির মত প্রাণঘাতী অবস্থার বা অবাঞ্ছিত শারীরিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। এক সময় আমেরিকার মত দেশগুলিতে এই ধরনের জঞ্জাল খাদ্য ব্যাপক ব্যবহৃত হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে এ সবের বিপদ বুঝতে পেরে টাটকা ফলমূল,স্যালাড ইত্যাদির প্রতি আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। এখন পিজা বার্গার জাতীয় খাদ্য আমেরিকার মত দেশে প্রধানত দরিদ্রের খাদ্য। কিন্তু ভারত-বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশগুলিতে আধুনিকতা ও আমেরিকান সংস্কৃতির নামে ঐ সব জঞ্জাল খাদ্যের বাজার সৃষ্টি হয়েছে এবং এ-সব দেশে তা মূলত মধ্যবিত্ত ও স্বচ্ছলদের খাদ্য। এর ফলে এসব দেশেও হৃদরোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯০ সালে সারা বিশ্বে দেড়কোটি মানুষের মৃত্যু হৃদরোগের কারণে হয়েছে। এর মধ্যে শুধু ভারতে হৃদরোগ জনিত মৃত্যুর সংখ্যা ২৫ লক্ষ। এর পেছনে কারণ হিসেবে অবশ্য শুধু ঐ জঞ্জাল খাদ্যগুলির ব্যপকতা নয়, শারীরিক পরিশ্রম কমে যাওয়াও একটি বড় ভূমিকা পালন করে। আরোএকটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, বস্তিবাসীদের মধ্যে স্থূলতা (ওবেসিটি)-র হার পুষদের ক্ষেত্রে শতকরা ১ ভাগ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে ৪ ভাগ, অন্যদিকে মধ্যবিত্ত, উচচবিত্ত ও ধনী শহরবাসীদের মধ্যে এই হার ভয়াবহভাবে অনেক বেশি, — শতকরা যথাত্রমে ৩২.২ ও ৫০ ভাগ। এই স্থূলতার সঙ্গে হৃদরোগ, ডায়াবিটিস ও অকালমৃত্যু অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং তার সৃষ্টির পেছনে আমাদের রান্নাঘরের চারিত্রিক পরিবর্তন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

খাদ্য থেকে পরিবেশগত বিপর্যয় ও তার থেকে জনস্বাস্থ্য হানির ব্যাপারটি শুধু স্থূলতা ও হৃদরোগের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নেই। বিস্বজুড়ে ত্রমবর্ধমান ক্যান্সার সৃষ্টির পেছনেও তার ভূমিকা আছে। স্টার্চ তথা শর্করাসমৃদ্ধ খাদ্য উচচ তাপে অ্যাত্রিলামাইড নামে ক্যান্সারসৃষ্টিকারী পদার্থের সৃষ্টি করে বলে দেখা যাচ্ছে। এই কারণে বার্গার কিন ও ম্যাকডোনাল্ড থেকে বিত্রি হওয়া ফ্রেঞ্চ ফ্রাই-তে দেখা যাচ্ছে অ্যাত্রিলামাইডের পরিমাণ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত, নিরাপদ মাত্রার চেয়ে ১০০ গুণ বেশি। মাত্র আটগ্রাম পটাটো চিপস বা দশগ্রাম ফ্রেঞ্চ ফ্রাইতে অ্যাত্রিলামাইড পাওয়া গেছে এক মাইত্রোগ্রাম, যা নিরাপদ মাত্রার থেকে বহু বহুগুণ বেশি। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত নিরাপদ মাত্রা হল এক লিটার পানীয় জলে সর্বাধিক এক মাইত্রোগ্রাম । এমনকি পপকর্ন, বিস্কুট ও কুকিজ, পটাটো চিপস্ জাতীয় খাবারেও অ্যাত্রিলামাইডের ভয়াবহ মাত্রা পাওয়া যাচ্ছে। অন্যদিকে আলু, চাল অন্যান্য সব্জি ইত্যাদি চিরাচরিত ভাবে সেদ্ধ করে রান্না করলে এবং টাটকা ফলমূল বা কাঁচা শাকসব্জিতে অ্যাত্রিলামাইড থাকে না বা তৈরী হয় না। এই অ্যাত্রিলামাইড জিন- এর বিকৃতি বা পরিবর্তন ঘটায়, মস্তিষ্ক ও নার্ভতন্ত্রের ক্ষতিসাধন করে। আর ক্যান্সার তো সৃষ্টি করেই। এখনকার যে সব শিশু ও আধুনিক মানুষ পপকর্ন, কুকিজ, পটাটো চিপস জাতীয় খাদ্য হরদম খাচ্ছে তাদের শরীরে ধীরগতিতে অ্যাত্রিলামাইড জমছে। কয়েক দশক পরে তা সৃষ্টি করবে ক্যান্সার, মস্তিষ্কের ক্ষয়জনিত রোগ, বিকলাঙ্গ শিশু। ইতিমধ্যে তা করতে শুও করেছে।

সব মিলিয়ে আধুনিক বিশ্ব মানুষের ত্রমবর্ধমান ভোগবাদ ও লোভ প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও পরিবেশগত সুস্থিতি যেভাবে বিনষ্ট করছে, তা মানুষের অস্তিত্বই বিপন্ন করে তুলছে। এটি আশার কথা যে কিছু মানুষ তা উপলব্ধি করেতার বিদ্ধে লড়াই শু করেছেন,এই লনাই যদি দ্রুত সাফল্য না পায়, তবে আগামী এক শতকের মধ্যেই পৃথিবী পরিপূর্ণ হবে অসুস্থ, বিকলাঙ্গ, জড়বুদ্ধি কর্কট রোগাত্রান্ত মানুষের দ্বারা।

একটি বেশ চালু ও জনপ্রিয় কথা হচ্ছে — দারিদ্রই সবচেয়ে বড় দূষণ। দুঃখের বিষয় এটি প্রকৃত সত্য থেকে বহু দূরে। এখন পৃথিবীর পরিবেশগত বিপর্যয়ের পেছনে প্রধানতম ভূমিকা পালন করে স্বচ্ছল ধনী ব্যক্তিরাই। তারাই গাড়ি চড়ে, ফ্রীজ ব্যবহার করে। তার ফলে তারাই বাতাসে বেশি ক্লোরোফ্লুরোকার্বন মিশিয়ে ওজোন স্তরের বিনষ্ট ঘটিয়ে ত্বকের ক্যান্সার, চোখের রোগ সহ নানা ব্যাধির বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। এই সব ব্যাধিতে কিন্তু ভূগছে ধনীদরিদ্র সবাই। কারণ ওজোন স্তরের বিনাশের কারণে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি সবার উপরই পড়ে— ধনীদরিদ্র ভাগ করে নয়। ধনী দেশ বৃক্ষ নিধন করে বাতাসে অক্সিজেন কমাচ্ছে। ঐ বাতাস কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্রই ছড়িয়ে যায়। তৃতীয় বিশ্ব গাছ লাগিয়ে এই অক্সিজেনের যোগান বাড়ালে তাও ছড়িয়ে যায় সর্বত্র। এই ভাবে দরিদ্র ও তৃতীয় বিশ্বের দেশের অক্সিজেন চুরি করে শিল্প সমৃদ্ধ ধনীদেশের মানুষ বাঁচছে। মুষ্টিমেয় স্বচ্ছল ও ধনীরা যে বিপুল পরিমাণ ভোগ্যপণ্য ব্যবহার করে এবং তার কারণে পরিবেস দূষণ

ঘটে, গরিষ্ঠসংখ্যক দরিদ্রদের দ্বারা করা দূষণ তার ধারে কাছেও যেতে পারে না। এ ব্যাপারে ওজোনস্তরবিনষ্ট করার জন্য মুখ্যত দায়ী যে ক্লোরোফ্লুরোকার্বন শুধু তার হিসেব তেকেই পুরো ব্যাপারটি বোঝা যাবে। আমেরিকার প্রতি ১.৮ জন মানুষ পিছু একটি গাড়ি, পশ্চিম ইয়োরোপে ২.৮ জন পিছ, জাপানে ৪.২৩, কানাডায় ২.২ জন পিছু। অন্যদিকে ভারতে ৫৫৪ ও চীনে ১৩৭৪ জন পিছু মাত্র একটি গাড়ি। এবং এ গাড়িও চড়ে স্বচ্ছলরাই। ওদের অধিকাংশই শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। যেমন আমেরিকার শতকরা ৮০ ভাগ গাড়িই শীততাপনিয়ন্ত্রিত যা ক্লোরোফ্লুরোকার্বন ববেহার করে বাতাসে মেশায়। কয়েক বছর আগের একটি হিসাব থেকে দেখা, আমেরিকা জাপান, কানাডা পশ্চিম ইয়োরোপ ও অস্ট্রেলিয়ার মানুষ পৃথিবীতে ব্যবহৃত ক্লোরোফ্লুরোকার্বনের শতকরা ৭০ ভাগ ব্যবহার করে, রাশিয়ার১৪ ভাগ এবং চীন ভারত আফ্রিকা দক্ষিণ আমেরিকাসহ সমস্ত উন্নয়নশীল দেশের মানুষ মাত্র ১৬ ভাগ। সব মিলিয়ে দারিদ্র্য নয়, — ভোগ বাদ ও বৈষম্যই পরিবেশ বিপর্যয়ের মূল কারণ। এবং এই পরিবেশগত বিপর্যয় প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের যে বিনষ্টি ঘটাচ্ছে তার প্রতি ফলন ঘটছে আমাদের স্বাস্থ্য ও জীবনের উপরও ।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com